ভয়ঙ্কর রহস্য গল্প

এল আর বিশ্বাস

একটি জলছবি প্রকাশনা

ভয়ঙ্কর রহস্য গল্প ১

ভয়ঙ্কর রহস্য গল্প

এল আর বিশ্বাস

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০
প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
সড়ক নং ৬, শেখেরটেক, আদবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
সোহাগ পারভেজ

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা

ISBN : 978-984-94524-5-4

মূল্য ২০০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.com

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

Copyright @ Author

Voyangkor Rahasso Golpo, Written by **L R Biswas**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2020, Price Taka 200, US $ 7

All rights reserved under the International and National Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from L R Biswas or from the publisher AKM Nasiruddin Ahmed of Jalchhabi Prokashon, Dhaka, Bangladesh.

Price: 200 Taka

উৎসর্গ

আমার কন্যা ***যারীন তাসনিম মহুয়া***
ও
জামাতা ***মোঃ মনির হোসেন***
স্নেহাস্পদেষু

লেখকের প্রকাশিত আরও কয়েকটি বই

- একদিন এক বন্ধা সময় (কাব্যগ্রন্থ)
- এখনও আমি আগের মত (কাব্যগ্রন্থ)
- ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প (ভৌতিক গল্প)
- মুগলীর ভাষা ও মাতৃভাষা (প্রবন্ধ)
- অধরা চাঁদের জ্যোৎস্না (উপন্যাস)

সূচিপত্র

অদ্ভুত ঈগল	...	৭
সমুদ্র তটে বিস্ময়	...	১৪
সাকিবের বিস্ময়	...	১৯
ভৌতিক বিস্ময়	...	২৪
ভূতুরে বাড়ি	...	৩০
অভিশপ্ত বট গাছ	...	৩৮
কষ্টিপাথরের মূর্তি	...	৪৩
ছায়াভূত	...	৪৮
পিরামিডের দেশে	...	৫৪
যন্ত্রগুলো যাচ্ছেতাই!	...	৬১
রহস্য মানুষ	...	৬৮
ক্ষ্যাপা ভূত	...	৭৫

অদ্ভুত ঈগল

আশিক জীবনকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে। নিজেকে নিয়ে ভালো স্বপ্ন দেখতে তাকে উৎসাহিত করেছেন তারই শিক্ষক ওসমান গনি স্যার। স্যার এমনিতেই চুপচাপই থাকেন। কিন্তু ক্লাসে এলে পড়া ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে ছাড়েন। তখন তিনি অনেক কথা বলেন। নানা উদাহরণ ও জ্ঞানীজনদের নানা উদ্বৃতি-উদাহরণ দিয়ে থাকেন। ওসমান স্যারের একটা বিশেষ গুণ আছে, তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ দেখেই মনের ভেতরটা অনেকখানি পড়তে পারেন।

আশিক সম্পর্কে স্যারের ধারণা, ছেলেটা সৎ ও পরিশ্রমী। সময় জ্ঞান ও কাজের প্রতি ভালোবাসা আছে। স্যার মনে করেন, ছেলেটাকে পথ দেখাতে পারলে অনেক দূর যেতে পারবে।

ওসমান স্যার একদিন আশিককে জিজ্ঞেস করলেন–

আশিক, বড় হয়ে কী হতে চাও তুমি?

আশিক বললো, স্যার এখনও ঠিক করিনি।

স্যার বললেন, কী হতে তোমার ভালো লাগে?

আশিক কলম দিয়ে খাতার ওপর এলোমেলো দাগ দিচ্ছে। কিছুই বলছে না।

স্যার আশিকের মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন।

স্যার বললেন, তোমার কি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে মন চায়?

– স্যার সবাইতো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

– তোমার মন কী বলছে?

– স্যার, ঠিকভাবে বুঝতে পারছি না। তাছাড়া এখনও তো অনেক সময় আছে।

– আশিক তুমি খুব মেধাবি ছেলে। তুমি নিশ্চয়ই একদিন অনেক বড় কিছু হবে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, তা হলো, তোমার মন যা বলবে বা করতে চাইবে, তুমি তাই করবে। অন্য কারও কথায় নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবে না। তোমার শিক্ষক হিসেবে আমি তোমাকে কতগুলো বিষয়ে ধারণা দিতে পারি। বেছে নেবার দায়িত্ব তোমার।

স্যারের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে আশিক কিছুটা লজ্জা পেলো। তারপর স্যার ক্লাসের সবার উদ্দেশে বললেন, কাল আমি ক্যারিয়ার প্লান নিয়ে ক্লাসে কথা বলবো। তোমরা সবাই কিন্তু নোট করে নেবে। তারপর ভেবে দেখবে নিজের মন কোন কাজটা করতে সায় দেয় এবং যে কাজটা করে তুমি আনন্দ পাও, সেই কাজটা করার জন্যই অবিরাম চেষ্টা করে যাবে।

স্কুল ছুটির পর বাড়িতে গিয়ে আশিক কিছুটা চিন্তা করতে লাগল– কী হওয়া উচিত তার, কী হতে মন চায় তার? শেষ পযর্ন্ত মনে মনে ভাবলো, স্যার তো কাল ক্লাসে সবকিছুই বলবেন। আগে তো শুনে নেই কী-কী হওয়া যায়! তারপর না হয় কোন একটা বিষয় নিয়ে ভাবা যাবে। তাছাড়া বাবা-মায়েরও তো সম্মতি থাকতি হবে।

পরের দিন সকাল এগারোটায় স্যার ক্লাসে এলেন। স্যারের হাতে নোটবুক। তিনি টেবিলের ওপর নোটবুকটি রেখে পেছনে হাত বেঁধে নিচের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর স্থির হয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন এবং স্যার বলতে শুরু করলেন–

আজ যে বিষয়টি আলোচনা করবো, তা তোমাদের বইয়ের সাথে মিল খুঁজে পাবে না। তবে এতে ভবিষ্যতে তোমাদের জীবন গড়ার স্বপ্ন তৈরি হবে। প্রত্যেকে খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। আমি বিভিন্ন পেশা বা ক্যারিয়ার প্ল্যান নিয়ে কথা বলবো। এতে তোমাদের নিজ নিজ পছন্দ বেছে নিতে সুবিধা হবে আশা করছি।

আশিক বললো, স্যার একটা কেন? আমি তো অনেক কাজ করতে চাই।

স্যার বললেন, তোমার অনেক গুণ আছে সে তো ভালো কথা। তবে অনেকগুলো একসাথে করার চেষ্টা করলে সবগুলোই গুলিয়ে যাবে। কোনটায়ই তেমন ভালো করা যাবে না। অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ একসাথে সফলভাবে করা যায় না। তাই কোন একটাতে বিশেষ গুরুত্ব দিলে ভালো ফল

পাওয়া যায়। এবার তাহলে বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে আলোচনা করছি। তোমরা খাতা-কলম নিয়ে তৈরি তো? যেটুকু গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে তা লিখে রেখো।

স্যার এক-এক করে মোটা দাগে চৌদ্দটি পেশা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এগুলো হলো–

১। ডাক্তার ২। ইঞ্জিনিয়ার ৩। আর্কিটেক্ট ৪। বৈমানিক ৫। একাউন্টস্ অ্যান্ড ফিন্যান্স ৬। ভাষাতত্ত্ব ৭। শিল্পকলা ও সাহিত্য ৮। অর্থনীতি ৯। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১০। ভূতত্ত্ব ১১। নৃবিজ্ঞান ১২। মার্কেটিং ১৩। গণিত এবং ১৪। বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে স্যার বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখার বিবরণ দিলেন। ক) মহাকাশ বিজ্ঞান খ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গ) কম্পিউটার বিজ্ঞান ঘ) আবহাওয়া বিজ্ঞান ঙ) সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।

আশিক প্রশ্ন করলো–

স্যার সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংটা কী?

স্যার বললেন, বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার আবিস্কার ও এর ব্যবহার মানব সভ্যতাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখছে সফ্টওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো।

আশিক বললো, কীভাবে স্যার?

স্যার বললেন, যেমন ধরো এই যে মোবাইল ফোন, নিত্যনতুন সুবিধা নিয়ে বের হচ্ছে, তা কী করে হচ্ছে? সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা মেধা খাটিয়ে নতুন নতুন সফটওয়্যার আবিস্কার করছেন। রোবট সোফিয়ার কথা তোমাদের মনে আছে?

সবাই বললো, হ্যাঁ স্যার মনে আছে। বাংলাদেশে এসেছিল।

স্যার বললেন, এই যে সোফিয়া, সে কীভাবে কথা বলবে, কী কী কাজ করবে, তার সবটুকুই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা আগে-ভাগেই করে দিয়েছিলেন।

বিষয়টি আশিকের মনে ধরলো। সেই থেকে আশিক অবিরাম স্বপ্ন দেখতে থাকলো। সে বড় হয়ে সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হবে। তার মন থেকে এই স্বপ্ন এক মুহূর্তের জন্যও হারিয়ে যাচ্ছে না। সে ভাবছে, এ বিষয়ে সে বিদেশে পড়তে যাবে। সফ্টওয়্যার এর খুঁটিনাটি সে সবকিছু শিখবে। তারপর নতুন ধরনের রোবট আবিস্কার করবে, চালকবিহীন গাড়ি, ট্রেন, জাহাজ, উড়োজাহাজ সবকিছু আবিস্কার করবে। তার মনে নানা স্বপ্ন বাসা বাঁধলো। এ ছাড়াও আর একটা বিষয় আশিকের মনে বার বার ঘুরে ফিরে আসছে। সে চালকবিহীন

রিকশা আবিস্কারের কথা ভাবলো। রিকশায় চড়া নিয়ে ওর মনের কষ্টই হয়তো এ ধরনের চিন্তার জন্ম দিয়েছে। কেননা, আশিকের বাসা থেকে ভার্সিটিতে যাবার জন্য গাড়ি ধরতে মূল সড়কে যেতে হয়। দু-মিনিটের রাস্তার জন্য রিকশাওয়ালারা পঁচিশ টাকা দাবি করে। বাবার রোজগারের এতোগুলো টাকা রিকশাওয়ালাকে দিতে খারাপ লাগে আশিকের। তাই প্রায় দিনই সে হেঁটে মূল সড়কে আসে। ওর স্বপ্ন হলো যে, বাসার সামনে একটি রিকশা দাঁড়িয়ে থাকবে। ও বাসা থেকে বেরিয়ে রিকশায় উঠবে, অমনি রিকশাটি আপনা থেকেই চলতে চলতে মূল সড়কে যাবে। ওকে নামিয়ে দিয়ে আবার নিজে নিজেই বাসায় ফিরে যাবে রিকশাটি।

ভবিষ্যতের ভাবনা আশিকের মনে একদম স্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে। আশিক একদিন খাটের ওপর শুয়ে আছে। এমন সময় আশিক শুনতে পেল কে যেন তাকে বলছে–

তুমিতো কানাডায় পড়তে যাচ্ছো! কানাডার ভ্যাঙ্কুভার ইউনিভার্সিটিতে তোমার স্কলারশিপ হয়েছে।

সে আরও দেখতে পেল যে, একটা কালো রংয়ের মাইক্রোবাস ওদের বাসার সামনে এসে থামল। কয়েকজন লোক ওকে অনেকটা জোর করেই হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে এয়ার কানাডার প্লেনের ভেতরে নিয়ে বসিয়ে দিল। যদিও এয়ার কানাডার কোন প্লেনের বাংলাদেশে রুট নেই। প্লেনটি আকাশে ওঠার সময় আশিক কিছুটা ভয় পেল। ভাবল, এই বুঝি ভেঙ্গে মাটিতে পরে যাবে। এমন ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা আশিক এবারই প্রথম প্লেনে চড়েছে। তারপর প্লেনটি অনেক উঁচুতে উঠে মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল। চারিদিকে মেঘ আর মেঘ। আশিক হঠাৎ শুনতে পেল মাইকে একজন বলছে–

আমি প্লেনের পাইলট বলছি। সামনে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হবে। প্লেনে ঝাঁকুনি লাগতে পারে। আপনারা ভয় পাবেন না। আপনাদেরকে সিটবেল্ট না খোলার জন্য অনুরোধ করা হল। এর মধ্যে আশিক অনুভব করলো যে, প্লেনটি সাঁই-সাঁই করে নিচে নেমে যাচ্ছে। আশিকের নাভির কাছে চিন-চিন করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর প্লেনটি একটু স্বাভাবিক হল। কয়েক মিনিট পরে আবারও প্লেনটি নিচের দিকে নেমে যেতে লাগল। ভয়ে আশিকের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। আশিক দুই হাত দিয়ে সীটের দুই দিকের হাতল শক্ত করে ধরে রাখল। আশিক প্লেনের উইন্ডো দিয়ে দেখতে পেল ছোট-বড় নানা আকারের এবং রংয়ের অনেক পাহাড়ের ওপর দিয়ে ওদের

প্লেনটি যাচ্ছে। আবারও প্লেনটি আচমকা নিচের দিকে নেমে যেতে লাগল। এই অবস্থায় আশিকের চোখের সামনে শুধু ওর মায়ের মুখখানা ভেসে উঠল। আশিক আস্তে আস্তে বলতে লাগল–

মা! ও মা! মাগো...

কিন্তু আশিকের মা ডাক কেউ শুনতে পেল না।

এভাবে কিছুক্ষণ পেড়িয়ে গেল। আশিক কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল। ওর গায়ের ঘামও ধীরে ধীরে কমে এল। আশিক প্লেনের সীটের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছে। এমন সময় হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি এবং যাত্রীদের চিৎকারে আশিকের চোখ খুলে গেল। সে আবারও সীটের দুদিকে দুহাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখল। সে অডিওতে পাইলটের ভয়ার্ত গলায় নির্দেশ শুনতে পেল। 'টার্ন রাইট, টার্ন রাইট এ্যান্ড ক্লাইম্ব ২০ ডিগ্রী!'

আসলে সিনিয়র পাইলট ফার্স্ট অফিসারকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন যাতে হঠাৎ চলে আসা সামনের পাহাড়টি এড়িয়ে গিয়ে এর ওপর দিয়ে প্লেনটিকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়া যায়। এ সময় কক্‌পিটের (প্লেনের পাইলট যেখানে বসে প্লেন চালিয়ে থাকেন) যে সুইচটি অন করে পাইলট যাত্রীদেরকে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন সেই সুইচ অন ছিল। ফলে ফার্স্ট অফিসারকে দেয়া নির্দেশও আশিক শুনতে পেল।

আশিক দেখতে পেল প্লেনের সামনে মাইলের পর মাইল চওড়া পাহাড়। অনেক উঁচু! প্লেনটি পাহাড়ের মাঝ বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে। পাইলট ডানদিকে ঘুরে ও ওপরে উঠে পাহাড়টি ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর মাত্র কয়েক ফিট বাকি! কিন্তু সময় এতো কম যে পইলটের পক্ষে পাহাড় ডিঙ্গানো সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত প্লেনটি পাহাড়ের চূড়ার কাছে প্রচন্ড ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হল। চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা। দাউ দাউ করে জ্বলছে। মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে। আশিকের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আশিক প্লেন থেকে ছিটকে পড়ল। পাহাড়ের চূড়ার কাছে তুলার মতো নরম একটি খাদে আশিক আটকে গেল। আর প্লেনটি গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের নিচে পড়ে গেল।

কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। আশিক শরীরে ঠাণ্ডা অনুভব করল। বরফের ওপর শুয়ে থাকলে যেমনটা হয় আর কি! ওদের প্লেনটা হিমালয়ের হিম শীতল বরফের চূড়ায় ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। তাই তো সে বরফের ওপর পড়ে আছে। হাত-পা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গেছে। নাড়াচাড়া করতে পারছে না। কথাও বলতে পারছে না। শুধু চিন্তা করতে পারছে। এখান থেকে সে কীভাবে বাড়ি

যাবে? এখন আর কানাডা যাবার কথা তার মনে পড়ছে না। এ যায়গায় কেউ তো ওকে খুঁজেও পাবে না। বাঁচার কোন উপায় না দেখে সে কাঁদতে লাগলো–মা! মা গো! ওমা...

কিছুক্ষণ পর আকাশ অন্ধকার করে বিশাল একটি বাজপাখি আশিকের কাছে এসে নামল। বাজপাখিটি এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে একপা-দু'পা করে আশিকের কাছে এগিয়ে এল। আশিক ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, বাজপাখিটি বোধহয় ওর দুচোখ ঠুঁকড়ে খেয়ে নেবে। সে দুহাত দিয়ে নিজের দুচোখ চেপে ধরল। বাজপাখিটা শেষ পর্যন্ত কী করে, তা দেখার জন্য আশিক চোখের ওপরে রাখা হাতের আঙ্গুল একটু ফাঁক করে তাকাল। দেখল, পাখিটার চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। গাঢ় হলুদ রঙ্গের বিশাল বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে একবার ঠোঁকর দিলে আশিকের শরীর এফো-ওফোর হয়ে যাবে। প্রতি ঠোঁকরে কমপক্ষে এক কেজি মাংস তুলে নেবে। এমন সময় মায়ের মুখ ছাড়া আশিকের আর কিছুই মনে পড়ল না। তার বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তাতে কোন শব্দ বের হচ্ছে না।

আরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বাজপাখিটি বাঁ পা দিয়ে টেনে আশিককে উপুর করে দিল। তারপর আশিকের পিঠের ওপর উঠে বসল। আশিক ভাবল আর রক্ষা নেই! এবার তাকে খেয়েই ফেলবে। পাখিটি তার শরীরের কোথায় প্রথম ঠোঁকর দেবে তা তো আশিক জানে না। তাই সে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ঠোঁকরের তীব্র ব্যথা অনুভব করতে লাগল। এই বুঝি ঠোঁকর দিল–এই বুঝি মাংস খাবলে নিল!

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত পাখিটি তাকে ঠোঁকর দিল না। পাখিটি আশিকের ঘাড়ের কাছে বাঁ পা দিয়ে শার্টের কলার খামচে ধরল এবং ডান পা দিয়ে ওর কোমড়ের কাছে প্যান্টে খামচে ধরল। তারপর পাখা ঝাপটে পাখিটি উড়াল দিল। আশিককে নিয়ে পাখিটি উড়াল দেয়ায় আশিক আরও ভয় পেল। সে ভাবল, কোন মতেই এবার আর রক্ষা নেই। পাখিটি তার ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য বোধহয় ওকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। পাখিটির বাসায় পৌঁছানো মাত্রই সবগুলো বাচ্চা এবং পাখিটি মিলে ওকে ছিঁড়ে খুড়ে খেয়ে নেবে।

আশিকের কান্না আর থামছেই না–মা! ওমা! মাগো...

পাখিটি উড়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। আশিকের গায়ে ঠাণ্ডা অনুভব হলো। তার মনে হল, পাখিটি মেঘের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আশিকের শরীর ভিজে যাচ্ছে। ঠাণ্ডায় শরীরে কাঁপুনি ধরেছে। এত সময় ঝুলে থেকে ওর মাথা ঘুরছে।